OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 302 - 309
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 302 - 309
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

ধীরেন্দ্রনাথ করের উপন্যাস ‘আয় লো টুসু’ : লোকসংস্কৃতির বিবিধ প্রেক্ষণ

প্রশান্ত কুম্ভকার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ছাতনা চণ্ডীদাস মহাবিদ্যালয়, ছাতনা, বাঁকুড়া
Email ID : kumbhakrprasanta@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Folk Culture, Cultural Heritage. Folk Songs, Vaduliya Village, Vadu, Tusu, Jhumur, Rhyme, Working People.

Abstract
Dhirendranath Kar, a resident of Kenjakura village in Bankura district, is a popular writer of Rarh Bengal. A famous novel written by him is ‘Ai Lo Tusu’. The story of the novel is based on the life and culture of the working people of Chhatna area which is adjacent to Bankura. Although they have endured endless misery and proverty throughout their lives, they did not forget their culture. Through Bhadu, Tusu, Jhumur, Baul, Rhymes etc. they have retained the heritage of the folk and local culture alive. These folk songs and rhymes are interspersed with the captivating narrative of the novel in such a way that it will arrest the attention of any reader. Along with the folk songs, the special linguistic patterns of the working class of the region and the regional words used in the language have intensified the reality of the novel. All these points have been discussed at the appropriate place in the main article. The novel narrates how an educated urban comes to work in this rural region and integrates with the lifestyle of the natives, and how he takes initiatives to keep their cultural heritage alive. The writer wants to show that educated intelligentsia should come forward to keep alive the folk culture of rural Bengal which is getting extinct. There is no doubt, that the modern civilization and consumerism have ruined the balance of regional culture to a great extent. Yet, there are some people who live through dire distress, but still cherish folk culture in the core of their hearts. This is the light of hope for us. It is our duty to protect this tradition. Only then the folk culture can be revitalized. This is conveyed by the author in this novel.

Discussion

ধীরেন্দ্রনাথ কর পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার একজন স্বনামধন্য সাহিত্যিক হিসেবে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত। বড়ু চণ্ডীদাসের জন্মভূমি ছাতনার পার্শ্ববর্তী কেঞ্জাকুড়া গ্রামে তিনি বসবাস করেন। ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক সবক্ষেত্রেই তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ‘আয় লো টুসু’ উপন্যাসটি ২০১১ সালে প্রকাশিত হয়। অবশ্য তার আগেই ‘বাংলার আভাষ’ পত্রিকার

শারদীয়া ও কয়েকটি সাধারণ সংখ্যায় উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। মূলত এটি একটি গবেষণাধর্মী উপন্যাস যার মূলে রয়েছে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন প্রেক্ষিত। ছাতনা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষদের সঙ্গে তিনি মিশেছেন এবং তাদের জীবনচর্চাকে উপলব্ধি করে উপন্যাসে তা ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসের নামকরণ দেখে মনে হতে পারে যে, উপন্যাসটি শুধুমাত্র টুসু উৎসব ও টুসুগানকে কেন্দ্র করে রচিত। কিন্তু তা নয়, টুসুর সঙ্গে সঙ্গে ভাদু উৎসব ও ভাদুগান, ঝুমুরগান, বাউলগান, ছড়া, লোককথা প্রভৃতি উপন্যাসের বেশিরভাগ স্থান দখল করে আছে যেগুলি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক অমূল্য সম্পদ।

উপন্যাসটি পড়তে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে এর লোকভাষা যা পশ্চিম বাঁকুড়ার সাধারণ মানুষদের মুখের ভাষা। উপন্যাসের নায়ক পরাগ বন্দ্যোপাধ্যায় ভাদুলিয়া গ্রামের উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাংলার শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হবেন। মেদিনীপুরে তাঁর বাড়ি, যদিও তিনি পড়াশুনো করেছেন কলকাতায়। মেদিনীপুর থেকে 'রূপসী বাংলা' ট্রেনে তিনি ছাতনা স্টেশনে নেমেছেন। এই সময় তাঁর সঙ্গে রিক্সাওয়ালা পবন মালের কথোপকথনের ভাষাটি লক্ষ্য করবার মতো –

> "- কুথায় যাবেন বাবু?
> - যাব ভাদুলিয়া। তোমার কি রিক্সা আছে?
> - হ বাবু রিক্সা চালাই খাই, আমার নাম পবন মাল।
> - ভাদুলিয়া এখান থেকে কতদূর?
> - আইজ্ঞ্যা তা ক্রোশ দেড়েক হবেক, ইখেন থ্যাকে ডাইনে য্যাতে হবেক।
> - বাস চলে না?
> - চলে, তবে হরক্কোচ আছে, ইখেন থ্যাকে মোড় এ্যাক মাইল... আজকে ইস্‌টাইক
> ক্যরেছে... সে কন চিন্তা কত্যে হবেক নাই বাবু, ঝট ক্যরে পৌঁছাই দুব।"[১]

পশ্চিম বাঁকুড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলার লোকভাষা আধুনিক শিষ্ট ভাষার মূল ক্রিয়া রূপ থেকে পরিবর্তিত হয়ে একটি স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন এতটাই প্রকট যে শিষ্ট ভাষার সঙ্গে বাঁকুড়া জেলার লোকমুখে ব্যবহৃত ভাষার মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।[২] শব্দমধ্যস্থ 'ও'কার বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার মানুষের উচ্চারণে কখনো-কখনো 'উ'কার এবং 'অ' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন- কোথায়>কুথায়, তোমার>তুমার, কোন>কন। প্রমিত বাংলা ভাষার 'হ্যাঁ'-কে এখানে হ, হঁ, হুঁ রূপে লোকমুখে ব্যবহৃত হতে শোনা যায়।[৩] 'এ' ধ্বনি কখনো কখনো 'ই' এবং 'এ্যা' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন- থেকে>থ্যাকে, যেতে>য্যাতে। ক্রিয়াপদে স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয়ের বহুল ব্যবহার এই অঞ্চলের ভাষার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন- হবেক, যাবেক ইত্যাদি। এছাড়া কিছু কিছু শব্দ যা এই অঞ্চল গুলি ছাড়া আর কোথাও প্রচলিত নয়। যেমন উদ্ধৃত অংশে পবনের মুখে উচ্চারিত 'হরক্কোচ' (অসুবিধা/ ঝামেলা), 'ঝট' (শীঘ্র/ তাড়াতাড়ি) ইত্যাদি শব্দগুলি। শুধু পবনই নয় উপন্যাসের সমস্ত খেটে খাওয়া চরিত্র যেমন পারুল, পারুলের মা কুড়ানি, শিউলি, রতনমণি, শ্রীপদ, নরোত্তম দাস, গগন, আদুরী ও আরো অনেকেরই মুখের ভাষা হল এই পশ্চিম বাঁকুড়ার সাধারণ মানুষের ভাষা যা উপন্যাসটিকে একদিকে যেমন বাস্তবতার রূপ দিয়েছে তেমনি অন্যদিকে একটি 'লোকাল কালার'কেও তুলে ধরেছে।

উপন্যাসটির প্রথমদিকে দু'চার লাইনে আদিবাসীদের ঘরবাড়ি ও দেওয়ালের সৌন্দর্যের কথা লেখক বর্ণনা করেছেন। আমরা জানি আদিবাসীদের ঘরবাড়ি মাটির হলেও সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতায় অতুলনীয়। মসৃন উঠোন ও দেওয়াল এবং তাতে নানা কারুকার্য আদিবাসীদের ঘরবাড়ির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পরাগ পবনের রিক্সায় যেতে যেতে আদিবাসী সাঁওতালদের ঘরগুলো লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে সাঁওতাল ঘরগুলো খড়ের ছাউনি হলেও শ্রী আছে, মাটির দেওয়াল অথচ বেশ চিকন, দেওয়ালের এখানে ওখানে ছবি আঁকা যা চারুকলার মনোহর নিদর্শন। এছাড়াও দেওয়ালের পাঁশুটে বা সাদা রঙের বাহার বেশ খোলতাই, দরজার দুইপাশে জীবজন্তুর ফ্রেসকো, পাখির রিলিফ – অনবদ্য সব কলাকীর্তি।[৪] এ অঞ্চলের বিশিষ্ট গবেষক অরুণাভ চট্টোপাধ্যায়ের মতে-

> "এগুলি হল এঁদের মনের 'ক্যানভাস'। এর মধ্য দিয়ে এঁদের স্বতঃস্ফূর্ত সরলতা প্রকাশ পায়। বহুকাল আগে থেকেই আদিবাসী সাঁওতালরা এমন চিত্র এঁকে চলেছেন। ... দেওয়ালের ওপর

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 302 - 309
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নানা রকমের রঙ দিয়ে চিত্র তৈরি করা হয়। রঙগুলি এঁরা নিজেরাই তৈরি করেন। এসব রঙ দিয়েই দেওয়ালে – সাপ, মাছ, বাঘ, হাতি, ময়ূর, প্রজাপতিসহ লতা-পাতা, ফুল ও আলপনা আঁকা হয়।”[৫]

বিশেষ করে সাঁওতাল মহিলারা মাটির দেওয়ালে গোবর ও কালো ছাই দিয়ে ‘ছঁচ’ দেন। অনেক সময় খড়িমাটি ও চুন মেশানো হয়। এরপর খড় পুড়িয়ে কালো রঙ, ঘুশিং অর্থাৎ চুনাপাথর পুড়িয়ে সাদা রঙ, গিরিমাটি ও লাল মাটি থেকে লাল রঙ, গাছের পাতা থেকে সবুজ রঙ প্রস্তুত করে দেওয়ালে বিভিন্ন রকমের চিত্র অঙ্কন করা হয়।

যাইহোক, এবার উপন্যাসে ফিরে আসা যাক। ভাদুলিয়া গ্রামের মাথায় এসে পরাগ দেখেন দুটো মেয়ে ‘ব্যাদান’ ধান (বাইদ জমির ধান) কাটছে আর টুসুর গান গাইছে। পবনকে রিক্সার গতি মন্থর করতে বললে পবন ধীরে ধীরে রিক্সা দাঁড় করিয়ে দেয়। পরাগ কান পেতে শোনেন –

“আয় লো টুসু কাট্‌বি ধান
ব্যাতন দুব খিলি পান
সোনার বরণ ধান প্যাকেছে মাঠে।
কাট্‌বি লাড়া দুই কাহন
ছুটি পাবি স্যেই তখন
নদীর পারে সুয্যি যাবে পাটে।
ব্যাশাম বেলা যতেক ছুঁড়ি
খাবি বেগুন পড়া মুড়ি
(ওগো) আঁচল প্যাতে বসে নদীর ঘাটে।”[৬]

এই গানে লোকশিল্পীদের মনের কথাই ব্যক্ত হয়েছে। দুই কাহন অর্থাৎ বত্রিশ পণ ধান কাটলে তবে ছুটি পাওয়া যাবে। ‘ব্যাশাম’ শব্দের অর্থ হল সকালের দ্বিতীয় প্রহর বা জলখাবার।[৭] এই সময় বেগুন পোড়া মুড়ি বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার একটি অতি জনপ্রিয় এবং সুস্বাদু খাবার। গানটিতে আরও বলা হয়েছে যে, গায়ে হলুদ তেল মেখে নদীতে ‘সিনান’ সেরে অতিরিক্ত বেলা অবধি ধান কাটার কাজ করতে হয়। তারপর কাজ শেষ হলে ‘চিকন চাকন’ অর্থাৎ পরিষ্কার পরিছন্ন পোশাক পরে মেয়েরা হাটে চুড়ি কিনতে যাবে।

পরাগ ভাদুলিয়া হাইস্কুলে জয়েন করেন। রবিবার ছুটির দিনে তিনি গ্রাম পরিক্রমায় বের হন। ভাদুলিয়া খুব বড়ো গ্রাম। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, তন্তুবায়, তাম্বুলি, মাহিষ্য স্বর্ণকার, ডোম, মাল, বাউরি, মুসলমান প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের মানুষ এই গ্রামে বসবাস করে। ফলে জীবনের আলো ও অন্ধকার দুটি দিকেই এই গ্রামে স্পষ্ট ধরা পড়ে। যদিও আজকাল গ্রামাঞ্চলেও পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে। ভাদুলিয়া কুটির শিল্পপ্রধান গ্রাম। এখানকার তাঁতের কাপড় ও কাঁসার বাসন যায় বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও নেপালে। নরম পাথরের নানান জিনিষ এখানে তৈরি হয়। ভাদুলিয়ার লাগোয়া আড়াইডাঙা গ্রাম। এখানে মালেরা বসবাস করে। খড়ে ছাওয়া ঘর, মাটির দেওয়াল, সর্বত্র দৈন্যদশা। ঘর দুয়ারের অবস্থান এলোমেলো, সামঞ্জস্যহীন। ছেলে-মেয়েদের সর্বাঙ্গে অপুষ্টির চিহ্ন। এই পাড়ার প্রায় সবাই চাষবাসে মুনিষ কামিন (পুরুষ ও মহিলা শ্রমিক) খাটে। দু’চারজন সরকারের কাছ থেকে পাট্টা জমি পেয়েছে। কেউ রিক্সা চালায়, কেউ ভ্যানে মাল বয়, কেউ কেউ রাজমিস্ত্রির কাজও করে। সন্ধার পর অনেকে মাতাল হয়ে মারপিট করে। আবার এই পাড়াতেই এত অভাব-অনটন, দুঃখ-দারিদ্র থাকা সত্ত্বেও কেউ কেউ লোকসঙ্গীতকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই মালপাড়ার শেষপ্রান্তে এসে পরাগ শুনতে পান –

“ওলো ফুল ফুটিল বিয়া হৈল
আপন হৈল পর।
গাঁয়ের ম্যেয়া হাঁটাপথে
চ্যল্ল শোশুর ঘর।”[৮]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 302 - 309
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সহজ ভাব ও সহজ ভাষার গান এই লোকগানগুলি। বিয়ের পর মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে- তারই বিরহবিধুর চিত্র এই গানে ফুটে উঠেছে। পড়সি (প্রতিবেশী) সই বান্ধবীকে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে রাখতে যাচ্ছে। বরবাবুর আর তর সইছে না, তাই কোঁচা দুলিয়ে বর এগিয়ে চলেছে।

পবন, তার ভাগ্নী পারুল, পারুলের সমবয়সী শিউলি, পাড়ার ছেলে গগন, নরোত্তম দাস, শ্রীপদ, অধর- এরা সবাই অভাবী মানুষ। গানবাজনার যন্ত্রপাতি সেরকম নেই, ট্রেনিং নেই, তাদের গান গাইতেও কেউ ডাকে না। অবশ্য পবন মনসামঙ্গল গাইতে পারে বলে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে তার কিছু চাল-পয়সা হয়। তবুও এই কয়েকজন লোকসঙ্গীতকে ভালোবেসে আজও তার চর্চা করে চলেছে। পরাগের সঙ্গে এদের পরিচয় হয়। এরপর পারুল ও শিউলি সমবেতভাবে একটি টুসু গান শোনায় –

> “বল বল টুসুরানী তুমার কী সব চাই
> অ্যানতে যাব চকবাজারে কিনতে যদি পাই।
> কিনব হলুদ শাড়ি দুটা
> সায়া ব্লাইজ চুলের কাঁটা
> শিশিভরা ফুলম ত্যাল ম্যাখতে মাথায় চাই।”[৯]

শুধু কি তাই, হাটে গিয়ে টুসু গলার মালা নেবে, হাতের বালা নেবে, নকল সোনা নেবে তাতে দুঃখ নেই। এটুকুতে মেয়েদের মন ভরে নি। তারা টুসুকে আরও অনেক জিনিস কিনে দিতে চায়। যেমন খোঁপার ফুল, পাথর বসা কানের দুল, ভ্যানিটি ব্যাগ। ‘টুসুর ঘন কালো চুলে অচল হেয়ার ডাই’। তাই ভালো করে চুল আঁচড়াবার জন্য মেষের শিং-এর চিরুনি প্রয়োজন। সেই সঙ্গে তরল আলতা এবং হাইহিল তোলা জুতো টুসুর জন্য কিনে দিতে হবে। সুতরাং সবাইকে সেজে গুঁজে চকবাজার যাওয়ার জন্য মেয়েরা আহ্বান জানিয়েছে। আসলে এই সহজলভ্য দ্রব্যগুলিই তাদের সাধ এবং সাধ্য। তাদের সাধ্যের মধ্যে এই জিনিসগুলি দিয়েই নিজেদের সৌন্দর্যময় করে তোলে। সেই চিত্রই এই টুসুগানে টুসুর ওপর আরোপিত হয়েছে।

এরপর পারুল ও শিউলি পবনের কথামতো একটা ভাদুর গান ধরে। গানটি এই রকম –

> “অতদূরে আসমানটায় তারা ফুটেছে,
> ভাদুর আমার এ্যাতদিনে বর জুটেছে।
> সোনারাঙা বরবাবু ভাদুকে দ্যাখেছে,
> ভাদুকে দেখে বরের মন বড় মজেছে।”[১০]

গানে বলা হয়েছে, অনেক অপেক্ষার পর ভাদুর একটি রাজপুত্রের মতো বর পাওয়া গেছে। ভাদু তাই হলুদ চন্দন ও ফুলম তেল অর্থাৎ সুগন্ধি তেল গায়ে মেখেছে। ঘোড়ার পিঠে নয়, হাতির পিঠে চেপে বর আসছে। ভাদুর যত মাসি-পিসিরা উলুধ্বনিতে পাড়া মুখর করে তুলেছে। এইগানে প্রকৃতির একটুকরো চিত্রও অসাধারণ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে -

> “অই রাধাচূড়ায় কিষ্ণচূড়ায় ফুল ফুটেছে
> মৌমাছিরা দলে দলে সেথায় ছুটেছে।”

আসলে এই লোকগান গুলিতে ‘দিন আনা দিন খাওয়া’ পরিবারের মেয়েরা নিজেদের আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের কথাই সহজ-সরল ভাষায় প্রাণবন্ত করে তুলেছে। এইসব গান পরাগের অত্যন্ত ভালো লাগে। লোকসঙ্গীতের যারা গবেষক তাঁরা জানেন যে গানের আসল জীবন লুকিয়ে আছে লোকগানে। প্রথমে লোকজীবনকে উপলব্ধি করতে হবে, তবেই লোকগানের স্বর্গীয় সত্তা খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে। গ্রামে গ্রামে গিয়ে গ্রামের মানুষকে দেখতে হবে, তাদের কথা শুনতে হবে। গ্রামের জলমাটিতে মিশলে লোকগানের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যাবে। আলো ঝলমলে অডিটোরিয়ামে লোকগান শুনলেও গ্রামের পটভূমি ও পরিবেশ পাওয়া যায় না। পরাগ এখানে চাকরি করতে এসে তাই পেয়েছেন। ফলে লোকগানের ধারক ও বাহকদের তিনি উৎসাহিত করেছেন এবং এই ধারাকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রত্যক্ষভাবে সর্বপ্রকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

পৌষপার্বণ এখানকার একটি অন্যতম প্রধান লোকউৎসব। সারা পৌষমাস হল টুসু পূজা এবং বনভোজনের মাস। ক্ষেতের ধান প্রায় সবই এই সময় খামারে নিয়ে এসে পালুই দিয়ে সাজানো থাকে। ধান ঝাড়াইয়ের কাজও শুরু হয়ে যায়। পাটা পেতে ধান ঝাড়াই এখন আর নেই। খামারে মেশিন দিয়েই ধান ঝাড়াই করা হয়। আগে পাটায় ধান ঝাড়াই করতে করতে কামিনরা গান গাইত –

"খামার খ্যুল্যায় উঠ্যেছে ধান পালুই সারি সারি,
আয় লো টুসু ঠেঙাব ধান যত কাহন পারি।
পাথরকাটা ধানের পাটা চ্যলত তাতে মশলা বাটা,
দুটা ঠাঙির পরে রাখি হোক না যতই ভারি।
আয় লো টুসু ঠেঙাব ধান যত কাহন পারি।"[১১]

এখন এইসব গান আর নেই। আগে গ্রামের চাষীরা গৃহের উঠানে ধানের মরাই বাঁধত। শুকনো সিদ্ধ ধান ঢেঁকিতে ভেনে চালের 'পুড়া' (শষ্য রাখার জন্য খড়ের তৈরি আধার) বেঁধে রাখত। লেখক বলেছেন, সে চালের ভাতের সুগন্ধ আজ অতীতের স্মৃতি। যাইহোক, এই সময় কুমোরপাড়ার প্রতি ঘরে টুসুর খোলা তৈরি হয়। অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিনে গ্রামের মেয়েরা সেই খোলা কিনে টুসুলক্ষীকে স্থাপনা করে। তারপর সারা পৌষমাস ধরে সন্ধ্যায় টুসুর গান করে। টুসু কোনো স্বর্গের দেবী নন। উপন্যাসিক বলেছেন, টুসু সাধারণ গ্রামের মেয়ে বা গৃহবধূ। তাঁর সংসারধর্ম পালনের নিষ্ঠা মেয়েদের প্রেরণা। তাই পশ্চিমরাঢ়ের টুসুগানে দেখা যায় যে, এখানে টুসু ঘরকন্না সামলায়, নদী থেকে কলসী কাঁখে জল নিয়ে আসে, গাই দোয়, ক্ষেতে ধান রোপন করে, ধান কাটে, ধান ঝাড়াই করে, তার কোনো অহংকার নেই, সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনধারায় সে আদর্শ রমনী।[১২] একাধারে সে গৃহলক্ষী এবং গৃহের লক্ষীমেয়ে। এই আদর্শ রমনীকে কেন্দ্র করেই টুসুর ব্রত ও পূজা। এই পূজায় কোনো পুরোহিত লাগে না, হৃদয়ের অন্ত:স্থল থেকে স্বতোৎসারিত গানই পূজার মূল মন্ত্র।

পৌষ মাসের শেষ তিনদিন হল চাউড়ি, বাউড়ি ও মকর। চাউড়ি দিনে মেয়েরা ঢেঁকিতে চাল কুটে। এইদিন সন্ধ্যায় চাকিপিঠা তৈরি হয়। বাউড়ি দিনে পুর দেওয়া নানা 'ঢঙের' পিঠা তৈরি হয় যাকে পুরুলিয়া-বাঁকুড়ায় 'গড়গড়্যা' পিঠা বলে। বাউড়ির সারারাত্রি গানে গানে টুসুর জাগরণ চলে। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসেও দেখি, আড়াইডাঙায় সন্ধ্যার পর বসেছে টুসুগানের আসর। পারুল, শিউলি, ময়না, চন্দনা মনসামেলায় গোল হয়ে বসে টুসুর গান করেছে। পারুল নিজেও গান লেখে। তার লেখাই একটি গান সুর করে কোরাস গায় –

"টুসুর খোঁপায় গাঁদা ফুল দোলে কানে সোনার দুল
ঝমর ঝমর নূপুর বাজে পায়।"[১৩]

এই গানের মধ্যেও দেখা যায়, টুসু একজন গ্রাম্য বধূ। সে তালপুকুরের ঘাটে স্নান সেরে রান্নার জন্য জল নিয়ে আসে। তারপর রান্নাবান্না সারে। আরেকটি গানে টুসুকে স্নান সেরে গুড়ি কুটতে বলা হয়েছে। পরদিন অর্থাৎ মকরের সকাল থেকে টুসুর বিসর্জন শুরু হয়। উপন্যাসে দেখা যায়, ভাদুলিয়ায় সব পাড়া থেকেই মেয়েরা দল বেঁধে টুসুর গান গাইতে গাইতে নদীর দিকে এগিয়ে চলেছে। দলের সামনেই এক মেয়ের মাথায় ফুল দিয়ে সাজানো টুসুর খোলা। পারুলের দল গায় -

"আমার টুসুর বিয়া দুব এক টাকা পণ লিব না,
গয়না দুব ভরি ছয়েক নকল সোনা ছুঁব না।"[১৪]

পরের গানে বলা হয়েছে যে, টুসু এখন ছোট মেয়ে, পুতুল খেলার বয়স। এই বয়সে কি বউ হওয়া মানায়। শ্বশুর ঘরে তো এক্কা দোক্কা খেলা চলে না। ফলে একা একা খাঁচায় বন্দি পাখির মতো দিন কাটাতে হয়। এরপর টুসুকে ভাসানোর জন্য জলে নামা হয়। সেইসময় বিদায়ের গান গাওয়া হয় -

"অ্যাসছে বছর অ্যাসো টুসু দুব পাটের শাড়ি,
শাড়ি প্যরে চৌদলাতে য্যায়ো শোশুরবাড়ি।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 302 - 309
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শোশুর বাড়ি য্যায়ে টুসু লিখবে একটা চিঠি,
প্যড়ে লিব চিঠিখানা আমরা বাপের বিটি।”[১৫]

গান শেষে নদীর জলে টুসুকে বিসর্জন দেওয়া হয়। এরপর মেয়েরা স্নান সেরে বালুচরে ‘কুমা’র আগুনে হাত-পা গরম করে ঘরে ফিরে আসে। এইভাবে সমাপ্ত হয় টুসু উৎসব। মকরের পরের দিন অর্থাৎ ১লা মাঘ ‘এখ্যান’ পরব। এদিন নতুন উনানে নতুন হাঁড়িতে রান্না হয়। গ্রাম্য দেবদেবীর থানে পূজা হয় এবং মোরগ, পায়রা অথবা পাঁঠা বলি দেওয়া হয়।

উপন্যাসের স্থানে স্থানে কয়েকটি ঝুমুর গানেরও সন্ধান পাওয়া যায় শ্রীপদ’র গলায়। এখন তারা পরাগের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে গানের প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। শ্রীপদ গায় –

“অসময়ে দিল কালা বিরহ বিষের জ্বালা
সে বিষ বেদনা আজি সুধার সমান।
(রঙ) অবশেষে আকুল করিল রাধা-প্রাণ।”[১৬]

এটি একটি ঝুমুর গান। গানে রাধাকৃষ্ণের দিব্য প্রেমের কথা বলা হয়েছে। মেয়েরা একটি লোকগীতি পরিবেশন করেছে –

“এই শহরে অ্যাসে মোরা গাইছি মাটির গান,
খ্যাটে খাওয়া মানুষ সব গলায় গাঁইয়া টান।
সারাটা দিন খ্যাটে খ্যুটে শাগে ভাতে খাই,
গানে নাই ত্যামন সুর বাজন তেমন নাই।”[১৭]

এই গানে গরীব দরিদ্র শিল্পীর নানা অভাবের কথা তুলে ধরা হয়েছে। শিল্পসাধনায় বিবিধ বাধার সম্মুখীন হয়েও তারা মাটির গানের ক্ষীণ স্রোতধারাকে জীবন্ত করে রেখেছে। পবনের একটি বাউল গানে গুহ্যতত্ত্বের কথা ব্যক্ত হয়েছে, যেখানে মানবদেহকে ঘরের সাথে তুলনা করা হয়েছে।[১৮] ঘরের মড়কচাতে ঘুন ধরে গেলে হঠাৎ করে বাড়ুই বা ঘরামি পাওয়া যায় না। আগে থেকেই ব্যবস্থা নিতে হয়। মূলত এই গানে গুরুকে ভজনা করে জীবন সমুদ্র পার হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

উপন্যাসের দু’একটি লোকগানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতনতার কথাও বলা হয়েছে। যেমন পবন ও গগন একটি গানে বলেছে –

“ওরে ও রাখালিয়া
লেখাপড়া শিখবি রে তুই
পাঠশালাতে গিয়া...
ডলিস কেন খৈনি হাতে
খৈনি খেলে বিপদ তাতে
মরণ এসে থাকবে দাঁড়ায়
শিয়রে আসিয়া...।”[১৯]

রাখালিয়াকে পাঁচনবাড়ি ফেলে বই-খাতা-কলম তুলে নিতে বলেছে। কারণ শিক্ষা ছাড়া জীবন বৃথা। এইগানে নেশার কুফল সম্পর্কেও জনগণকে সতর্ক করা হয়েছে। মদ, বিড়ি, সিগারেট খেলে নিজের শরীর ও পয়সা দুইই নষ্ট হয়, তাতে পেট ভরে না। তাই বলছে নেশা করে শেষে যখন শরীরে ক্যানসার বাসা বাঁধবে তখন পাশে কেউ দাঁড়াবে না। তাই ওসব বাজে নেশা ছেড়ে পড়াশুনার নেশায় মত্ত হলে জীবনে উন্নতি করা যাবে। অন্য একটি গানে বিভিন্ন রকম পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।[২০] সেখানে বলা হয়েছে আমাদের কঠোর হাতে শব্দদূষণকে প্রতিরোধ করতে হবে। তারজন্য মানুষকে মাইক ছেড়ে ‘অমাইক’ হতে হবে। ধোঁয়া, ধুলার বাড়বাড়ন্ত বায়ুদূষণ ঘটায়। এই বায়ুদূষণ মানব জীবনে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। তামাকজাত নেশায় ক্যানসার ছড়ায়। তাই যত শীঘ্র সম্ভব তামাকজাত দ্রব্য বর্জন করতে

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 302 - 309
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হবে। নইলে সংসার ছারখার হয়ে যাবে। এই গানে জলদূষণ ও প্লাস্টিক দূষণের কথাও বলা হয়েছে। জল দূষিত হলে নানান ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া জলে বাসা বাঁধবে। তাতে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ অসুস্থ হবে। পরিবেশকে ভালো রাখতে প্লাস্টিক দূষণকেও প্রতিহত করতে হবে। যত্ন করে প্রচুর পরিমানে বৃক্ষরোপণ করতে হবে। পরিবেশের ক্ষতি হলে মানুষের কিছুই ভালো হবেনা।

উপন্যাসিক ধীরেন্দ্রনাথ কর লোকসঙ্গীতের যে একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তা উপন্যাসের বৈচিত্র্যময় গানগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। টুসু, ঝুমুর, বাউলের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাঁকুড়া পুরুলিয়ার প্রসিদ্ধ ভাদু গান ও উৎসবের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। ভাদ্রমাস ভাদু পূজার মাস। এখন ভাদুর মূর্তিতে নানা ধরণের পরিবর্তন এসেছে। যেমন, গীটার হাতে ভাদু, হারমোনিয়াম কোলে ভাদু প্রভৃতি। সারা ভাদ্র মাস জুড়ে প্রতি সন্ধ্যায় মেয়েরা সমবেত গানের মধ্য দিয়ে ভাদু পূজা করে। এসব গানে থাকে মেয়েদের সুখ, দুঃখ, বিরহ, যন্ত্রনা। ভাদ্র মাসের শেষে ভাদুর বিসর্জনের সময় গ্রামের বিভিন্ন দলের মধ্যে যে ভাদু গানের লড়াই হয়, তা দেখার মতো। লেখক এই প্রসঙ্গে দুই দলের দু'টি গান তুলে ধরেছেন। প্রথম দল গেয়েছে –

"তোদের ভাদুর খ্যাঁদা নাক   ইখান উখান মাথায় টাঁক
ট্যারা দুটা চোখ
কপাল উঁচু গজাল দাঁত   চ্যলতে লারে পায়ে বাত
হাসে পাড়ার লোক।"

প্রত্যুত্তরে দ্বিতীয় দল গেয়েছে –

"ওলো থ্যাবড়ামুখী ভাদু তোদের রাঁধতে নাই জানে,
ঘুঁটে কুড়ায় গোরর ফ্যালে ঢেঁকিতে ধান ভানে।
গায়ের রঙ আলকাতরা লম্বা তাল গাছ,
খোঁড়া ঠ্যাঙে চলে যখন য্যেন বাঁদর লাছ।
বিড়াল চোখি পেত্নী ভাদু দেখলে করে ভয়,
বিয়া হ্যলে শোশুর বাড়ি ক্যরবে লয়ছয়।"

আরেকটি লোকগানে দেশি ধানের বিলুপ্তির কথা বলা হয়েছে যা, অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ঝিঙাশাল, আসনলয়া, কলমকাটি, ভুতমুড়ি, কনকচূড়া, সীতালতা, চন্দ্রকান্ত, দানাগুড়ি, তুলসীবকুল প্রভৃতি দেশি ধানের চাষ প্রায় উঠে গেছে। এখন সর্বত্র হাইএল্ডিং ধানের চাষ হচ্ছে। এই গানের মাধ্যমে দেশি ধানের নামগুলি বেঁচে থাকবে।

লোকগানের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি ছড়ার প্রয়োগও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে। উপন্যাসের প্রথম ছড়াটি প্রয়োগ করেছেন ভবতোষ ভাদুড়ি। তিনি ভাদুলিয়া হাইস্কুলের প্রেসিডেন্ট। পরাগ ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে। ফলে ভবতোষবাবু মনে মনে ঠিক করেছেন তাঁর মেয়ে চাইনির সঙ্গে পরাগের বিয়ে দেবেন। এবিষয়ে স্কুলের হেডমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গেও কথা বলবেন। কারণ– 'সবাই মিলে দিলে চাপ/পড়বে ফাঁদে ছ্যেলার বাপ' (পৃ. ২৩)। এরপরের ছড়াটির বক্তা পরাগ। শহর থেকে গ্রামের স্কুলে পড়াতে এসে তিনি গ্রামের দরিদ্র, অশিক্ষিত মানুষদের জীবন যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে দেশ মানে শুধু আলোকোজ্জ্বল শহর নয়, গ্রামগুলিও দেশেরই অংশ। একটা অংশ এখনো অন্ধকারে ডুবে আছে। এ প্রসঙ্গে তিনি যে ছড়াটি মনে মনে বলেছেন সেটি হল- "উপরে রঙ তামাশা, ভিতরে ছুঁচোর বাসা' (পৃ. ৩৭)

পরের ছড়াটি বলেছে ভবতোষবাবুর স্ত্রী বাসন্তী। পরাগ মেয়ে চাইনিকে টিউশন পড়াতে আসেন। চাইনির সঙ্গে পরাগের বিয়ে দিতে গেলে ভালো ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে যে ভালো খাওয়া দাওয়া দিতে হবে সে বিষয়ে বাসন্তী ওয়াকিবহাল। তাই ছড়ার মাধ্যমে তিনি বলেছেন – 'পেটে খেলে ঘি ননী/ আঙিনায় নাচে ধনি' (পৃ. ৩৫)। ওদিকে গার্ল স্কুলের সেক্রেটারি বাদলবাবু ও তাঁর স্ত্রী সুভদ্রা ঠিক করেছেন তাঁদের মেয়ে রাজেন্দ্রাণীর সঙ্গে পরাগের বিয়ে দেবেন। ফলে তাঁদের বাড়িতেও পরাগ রাজেন্দ্রাণীকে পড়াতে আসেন। বাদলবাবু স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করেন যে পরাগকে চোখে চোখে রাখতে হবে। নাহলে- 'একটু দিলে ঢিলে/ ছো মারবে চিলে' (পৃ. ৪০)। পরের ছড়াটি বলেছেন ভবতোষবাবুর বৃদ্ধা পিসিমা। শীতের সকালে রোদ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 302 - 309
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পোহাতে পোহাতে ছড়া কেটেছেন- 'পোষ মাসের জাড়ে/দারুণ খিদা বাড়ে' (পৃ. ৫৮)। এছাড়াও আরও কয়েকটি ছড়ার ব্যবহার এই উপন্যাসে হয়েছে, যা উপন্যাসটিকে বৈচিত্রময় ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

এইভাবে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, ধীরেন্দ্রনাথ করের 'আয় লো টুসু' উপন্যাসটির সিংভাগ জুড়ে রয়েছে ভাদু, টুসু, বাউল প্রভৃতি লোকসঙ্গীত এবং ছড়া। এছাড়াও রয়েছে লোকভাষা যা পশ্চিম রাঢ় অঞ্চলের মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সীমাহীন দারিদ্র, সামাজিক বঞ্চনা ও অবহেলার মধ্যে থেকেও এদের শিল্পবোধ এবং সংস্কৃতি চেতনা অনেক উন্নত। লোকসংস্কৃতির সাধনা, প্রাণময়তা ভাবৈশ্বর্য এই মানুষগুলিকে মহৎ করে তুলেছে। এইসব লোকগান ও ছড়াগুলি সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের অন্তঃস্থল থেকে স্বতোৎসারিত। আধুনিক সভ্যতা ও ভোগবাদ গ্রাম বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতির ভারসাম্যকে অনেকাংশে নষ্ট করেছে। তবুও কিছু মানুষ আছে যারা আজও হৃদয়ের গহীনে লালন করে চলেছে লোকসঙ্গীতের ক্ষীণ ফল্গুধারাকে। এটাই আমাদের কাছে আশার আলো। ভদ্র উচ্চশিক্ষিত মানুষদেরও লোকসংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য পরাগের মতো এগিয়ে আসতে হবে। তাহলেই লোকসংস্কৃতি আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। কারণ সময় এগিয়ে যাবে, মানুষও এগিয়ে যাবে এবং এটাই কাম্য, কিন্তু নিজের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক পরিচয়কে বিসর্জন দিয়ে নয়।

Reference:

১. কর ধীরেন্দ্রনাথ, 'আয় লো টুসু', সদানন্দ প্রকাশনী, কলকাতা, মে ২০১১, পৃ. ১০
২. চট্টোপাধ্যায় অরুণাভ, 'দৃশ্যে ভাষায় শিল্প-কলা', প্রান্তর, দুর্গাপুর ১৩, সেপ্টেম্বর ২০১৫, পৃ. ৮৬
৩. তদেব: পৃ. ৮৬
৪. কর ধীরেন্দ্রনাথ, 'আয় লো টুসু', সদানন্দ প্রকাশনী, কলকাতা, মে ২০১১, পৃ. ১১
৫. চট্টোপাধ্যায় অরুণাভ, 'দৃশ্যে ভাষায় শিল্প-কলা', প্রান্তর, দুর্গাপুর ১৩, সেপ্টেম্বর ২০১৫, পৃ. ৮০
৬. কর ধীরেন্দ্রনাথ, 'আয় লো টুসু', সদানন্দ প্রকাশনী, কলকাতা, মে ২০১১, পৃ. ১২
৭. চৌধুরী তারাপদ, 'মানভূম পুরুলিয়ার প্রচলিত শব্দকোষ', মানভূম সংবাদ প্রা. লি., পুরুলিয়া, ২০২১, পৃ. ১৩০
৮. কর ধীরেন্দ্রনাথ, 'আয় লো টুসু', সদানন্দ প্রকাশনী, কলকাতা, মে ২০১১, পৃ. ২৭
৯. তদেব, পৃ. ২৯
১০. তদেব, পৃ. ৩০
১১. তদেব, পৃ. ৪১
১২. তদেব, পৃ. ৪২
১৩. তদেব, পৃ. ৪৩
১৪. তদেব, পৃ. ৮০
১৫. তদেব, পৃ. ৮১
১৬. তদেব, পৃ. ৬৫
১৭. তদেব, পৃ. ৬৬
১৮. তদেব, পৃ. ৭৮
১৯. তদেব পৃ. ৯৪
২০. তদেব, পৃ. ৯৫